লাইটহাউসের মতো নীরবতা

সালমা বাণী

লাইটহাউসের মতো নীরবতা

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

লাইটপোস্টের মতো নীরবতা

সালমা বাণী

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

বাংলাদেশে পরিবেশক

কাগজ প্রকাশন

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৭৫ টাকা

Lightposter Moto Nirobota by Salma Bani Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29364-7-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মন ভালো নাই, চারদিকে সাদা আন্ধার
চোখ খুইলা ঘুমাই।

প্রিয় কবি শামীম রেজা

সূচিপত্র

দোজখ থেকে বেহেশত ৯
খোকড় ১৯
খোলা জানালায় দুলছে কষ্ট ২৭
হাওয়ায় দোলে মোরগের মাংস ৩৪
লাইটপোস্টের মতো নীরবতা ৪৫
শূন্যের উপর ছন্দ ৫২
রমণীয় রাত ৫৯
কফি কাপে বৃষ্টি ৬৭
দোলে কম্বল ৭৫
তাজা কলিজা উপহার ৮৭

দোজখ থেকে বেহশত

গভীর হচ্ছে রাত। বারান্দায় বসে আছেন তিনি। বাগানের হাসনাহেনা, শিউলি না হয় বেলি থেকে আসছে মিষ্টি সুবাস। পরনে একখানা লুঙ্গি আর গায়ে গরম চাদর। মাঘ মাস। মাঘের এই সময় শীত একটু বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু মনের অস্থিরতার কারণে বঙ্গবন্ধু হয়তো বিস্মৃত হয়ে গেছেন শীত লাগার অনুভূতি! অথবা হয়তো জেলের ভারী মোটা দেয়াল ডিঙিয়ে শীতের দাপট ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারেনি। একখানা গরম চাদরে জড়িয়ে গেছে মাঘের শীত। আসলে গরম চাদর ঠিক নয়, মনের ভেতরের উত্তেজনা, বেদনায় এমনই ডুবে আছেন তিনি, শীতের অনুভূতিও যেন ভুলে গেছেন।

কিছুতেই ঘুম আসে না চোখের পাতায়। একেবারেই যেন ঘুম নাই। চোখের ঘুম মাথার ভেতরে বসে গেছে চাপ চাপ দুশ্চিন্তা হয়ে। যেদিন রাতে দুশ্চিন্তা এমন তীব্র হয়, সেদিন এভাবেই রাত ভোর হয়। পত্রিকার একখানা সংবাদ রাতের ঘুম কেড়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

জেলখানার বারান্দায় যখন বঙ্গবন্ধু এমনই জেগে আছেন, ওপাশে তখন আলি হোসেন রাতের শিয়ালের মতো তাকায় তোতার দিকে। ওর চোখ দুটো এমনই জ্বলজ্বল করে রাতের শিয়ালের মতো। এখন আর তোতার মুখটা সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না আলি হোসেন। শুধু দেখা যাচ্ছে তোতার শরীরের পেছনের অংশ। মনে মনে গোনে বারোজনের পেছনে দাঁড়িয়ে তোতা। শুধু তোতা নয়, সে নিশ্চিত হতে চায় আরো একজন মানুষের অবস্থান। তখন তার চোখের সাদা-কালো দুই প্রান্তেই ধক ধক করে ভয়ংকর হিংসা-ক্রোধ। ধিকধিক করে ওঠে হিংসার থেকেও কঠিন জিঘাংসা। মনে মনে বলে, দুইটার কইলজার মইদ্দে দিছিলাম না একলগে হান্দাইয়া! তারও আগে আরো তিনডারে! সেই তিনডার কথা তো সরকারে বাইর করতেই পারে নাই। হাহাহা...দরকার হইলে তরেও, খানকির পোলা...।

পরপর দুই রাইত! তারপর গত রাইতরেও দুইবার প্রস্রাবখানার দিকে যাইতে দেখেছে একই সময়ে দুইজনকে। একবার তো দ্যাখতে পাইল পায়খানার ওপাশে অন্ধকার গলিটার কাছে। হারামজাদা, শুয়ারের বাচ্চা, বাঁইচা গ্যাছস! যদি একবার হাতেনাতে ধরা খাইতি, তাইলে...আত্মগতভাবে বিড়বিড়ায় আর বলতে থাকে, একবার হাতেনাতে ধরতে পারলে রমজানের মতো মুখের মইদ্দে পাতিলের কালি

আর গলার মইদ্দে জুতার মালা দিয়া সারাটা জেলখানার মইদ্দে হাঁটাইতাম বলদের মতো!

এই ইচ্ছাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে মনে পড়ে রমজানের মুখখানা! চৌকি দফাদার ছিল। গাঁট্টাগোট্টা পালোয়ানের মতো টাইট শরীরের রমজান। প্রায়ই ঠাট্টা কইরা কইতো, মধুর মতো বিষ জমে, দোস্ত, মধুর মতো বিষ, শরীলের মইদ্দে বিষ জইমা পোক হইয়া যায়। আর তো সহ্য হয় না। পছন্দমতো কয়েদি, হাজতি পটানির ওস্তাদ ছিল রমজান। একদিন ধরা পড়ল দিনদুপুরে। গুদামঘরে চাউল-ডাইল বাইর করার ডিউটির সুযোগে। কায়দামতো কাম সারছিল উঁচা উঁচা বস্তার গাদার আড়ালে। পড়বি তো পড় তাও আজমল পাহারার চোখে। যাকে বলে এক্কেবারে সুফি হুজুর। আর যায় কই? মাথার চুল ন্যাড়া, গলায় জুতার মালা আর চোখেমুখে, সারা শরীরে পাতিলের তলের কালি। তাতেও তার শাস্তির শেষ হয় নাই। চৌকি-দফাদারির ডিউটির বদলে দেয়া হইল আইনি দফায়। জেলখানার ভেতরে সব থেকে কষ্টের দফা হইল আইনি দফা। গরুর মতো ঘানি টেনে বের করতে হতো সরিষা থেকে তেল। অপমান আর কষ্টের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সুযোগমতো একদিন ফাঁসি দিল জেলের গুদামের পাশের গলিতে।

আলি হোসেনের প্রত্যাশা ছিল, তোতা আজ তার সামনে এসে দাঁড়াবে লাইন ধরার ঘণ্টা বাজলে। কারণ, গতকালও সে তোতাকে শুধু টাকা নয়, আরো সাপ্লাই দিয়েছে সিগারেট, বিস্কুট–এসবও। তোতাকে খুশি রাখার জন্য এমন করে কত কিছুই জোগাড় করে এই জেলখানার ভেতরে বসে। গত রোববার আলি হোসেনের ভাইরা ভাই, বোনের জামাই ওকে দেখতে আসলে তাদের কাছ থেকে সে টাকা জোগাড় করে। খুশি করার জন্য সেই টাকার বড় অংশ যায় তোতার পকেটে।

কিন্তু তোতা হারামজাদা বেইমান! তিড়িং-বিড়িং করতে করতে দাঁড়াইল গিয়া একেবারে লাইনের সামনে। তার সামনে দাঁড়াইলে কী হইত!

খুউব রাগ হয় আলি হোসেনের। কিন্তু সেই রাগ ভুলেও দেখাতে যায় না তোতাকে। আলি হোসেন নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর গোস্বা কমানোর জন্য আত্মগতভাবে বলে, থাক! পোলাপান! গোশতের লোভে কোনো দিকে এখন আর হুঁশ নাই, আহা রে একটুকরা গোশতের জন্য সারা সপ্তাহ কুত্তার মতো তাকাইয়া থাকে তরকারির ডেকচির দিকে।

আজ দুপুরের ডালভাতের সাথে দেয়া হবে গরুর গোশত। তোতা সপ্তাহ শুরুর আগেই খবর রাখে কোন দিন গোশত দেবে আর কোন দিন মাছ। দুপুরের ভাতের ডাকের ঘণ্টাও বাজায় সে। তার কাজের ডিউটি যা-ই পড়ুক না কেন, চোখেমুখে চোরা হাসির কমতি নাই। যেই কাজেরই ডিউটি পড়ুক, সেটাই শেষ করে লাফায়ে লাফায়ে। সে-ও আরেক কারণ ওয়ার্ডের সকলের খাতিরের, সকলের প্রিয় হয়ে ওঠার! যেদিন মাছ অথবা মাংস দেয়ার ঘোষণা থাকে, সেদিন শুধু তোতা নয়, কয়েদি, হাজতি সকলের চেহারা থাকে উৎফুল্ল, হাসিখুশি।

বেচারা ছোট মানুষ, এই ভাবনা আলি হোসেনের মনে মমতা বাড়ায়, ভালোবাসা বাড়ায়। কী যেন ভাবে মনে মনে। ঠোঁটের কোনায় চাপা এক হাসি মেঘের আড়ালে লুকানো বেলা শেষের সূর্যের মতো সামান্য উঁকি দেয়।

আজও মনে পড়ে সেই দিনের কথা, তোতা যেদিন এল কয়েদি হয়ে। তখনো দাড়ি-মোচ গজায়নি পুরোপুরি। চামড়ার নিচে সবেমাত্র গাঢ় নীলচে রঙের রেখা। যাকে বলে ছোকরা! একেবারেই ছোকরা। কেমন এক বেনামি মায়া জড়ানো ছিল সেই ছোকরা মুখের সবখানিজুড়ে।

কী রে, কামডা সারছিলি কী দিয়া? চাক্কু না দাও?

গরু জবাই দিছিলাম, গরু...কসাইয়ের দোকান থেইকা নিছিলাম গরু জবাইয়ের ছুরি! সহজ, ধীর, স্থির ও শান্ত উত্তর। এই উত্তর দেয়ার ধরনেও হাসি পেয়েছিল আলি হোসেনের। তোতার কথা বলার ধরন খুউব ভালো লাগে আলি হোসেনের। মায়া ছাড়াও সোহাগজড়ানো। জড়ানো আদর?

এই মায়ার নাম কী ? একদিন তোতাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে আলি হোসেন। তোতা কোনো রকম উত্তর দেয়ার আগেই আবার সে হাসতে হাসতে বলে, শুন রে তোতা পাখি, এই রকম মায়া-ভালোবাসার কোনো নাম নাই, বুঝলি? এইটারে কয় আওলা ভালোবাসা...আওলা...হাহাহা...

গায়ের রংখানা রোদজ্বলা তামাটে। হলদে ফরসা রং এমন তামাটে হয় তখনই, যখন সারা দিন রোদে জ্বলে। ঘন কালো চোখের পাপড়িগুলোর আগা ওলটানো। প্রথম দেখাতেই নজর লাগে। একপলকেই মনে হয় হাসির ঝিলিক চোখের তারায়। সেই হাসিভরা চোখের উপর তেমন ঘন কালো দুটো ভ্রু। দুইটা ভ্রু তো না, য্যান দুইটা ভ্রমর নাচে কথা বলার সময় কপালের উপর। যেমন নড়ে ভ্রু জোড়া, তেমন উলটাপালটা করে তার সিগারেটে পোড়া ঠোঁট দুইটা। একটুখানি নড়ে উঠলেই ঠোঁটের ভেতরের গোলাপি রং আর ঝকঝকে সাদা মুক্তার মালার মতো দাঁতের ঝিলিক।

তোতাও কম যায় না। দুষ্টামির হাসি ঠোঁটের তলে চেপে উত্তর দেয়, আমার মায়া দিয়া কাম নাই, এই মায়ার নাম থাক আর না থাক, আমার কী বাল আসে-যায় সেইটাতে! আমি বুঝি নগদ! নগদ পাইলে কথা কই...হিহিহি...। আমার ওস্তাদে কইতো, নগদ যা পাস, হাত পাইতা লঅঅ, বাকির খাতা খালি থাক।

কখনো কাগজ টুকানি, কখনো বাসাবাড়ির কামের পোলা–এই সবের ভান করে আসলে করত খোঁজারুর কাম। বয়স তখন কত হবে? আট কি নয়! তখন থেকেই ডাকাতের দলের সাথে কাজ করা। আস্তে আস্তে কাজের ডিমান্ড বাড়ে। বাড়ে বয়স। এরই মাঝে প্রেমে পড়ে সালেহার। সালেহা পাড়ার মেয়ে। তার সাথে প্রেম প্রেম খেলা সবেমাত্র শুরু। ধরা পইড়া আসলো জেলে। জেল থেকে ফিরে এসে দেখে ছোটবেলার বন্ধু শাহজাহান তারই প্রেমিকার সাথে প্রেম করছে। সহ্য করতে পারল না বন্ধুর বেইমানি। কসাইয়ে দোকান থেকে কিনা আনল গরু জবাইয়ের

ছুরি। ঘর থেকে ডেকে বের করে আনল এক দুপুরে। বিলের পাশে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল গরু জবাইয়ের ছুরিটাকে। সেই ছুরি দিয়ে শাহজাহানের মাথাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল শান্ত মেজাজে।

এদিকে আলি হোসেনের সেই ঘটনার দিন! এখনো বাংলা সিনেমার মতো চোখের সামনে ভাসে তার। দিনটা ছিল হাটের। গরু বান্ধা নিয়ে ঝগড়া বাধে আরেক গরুর মালিকের সাথে। ঝগড়ার একপর্যায়ে ধারালো চাক্কুটা ঢুকাইয়া দিল একেবারে বুকের খাঁচায়, হাটভরা মানুষদের সামনে। বাবাকে বাঁচাতে ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়লে বাপের বুকের থেকে টেনে বের করে সেই চাকু বসিয়ে দেয় ছেলের বুকে। বাপ-ছেলে দুজনকে খুন করে পালায়নি! দাঁড়াইয়া ছিল খুনের চাক্কু হাতে ধরে আর সেই চাক্কু বেয়ে টপটপিয়ে গড়াচ্ছিল রক্ত। তারপর জোড়া খুনের জন্য কুড়ি বছরের সাজা। সবেমাত্র নয় বছর গেল। আঙুলের কড়ায় বছর গোনে আর বিড়বিড়ায় যতগুলো বছর পার হইছে, এখনো ততগুলা বচ্ছর পার করতে হইব। এই শালার কুড়ি বচ্ছর পুরা করতে।

যখন জীবন-যৈবন সব যাইব এই জ্যালের মইদ্দে, তহন আর কী করনের! জীবনের লাইগা, বডিটারেঅও হ্যান্ডেল করতেই লাগে। এই সব জীবনবিষয়ক ভাবনায় সে আনমনা হয় আপনার ভেতরে। এখন আর ওকে ভাবায় না বাইরের জীবনের কথা। অথবা ভেবে লাভ নাই জেনে ওসব একেবারে বাদ। তিন-তিনটা বিয়ে করেছিল জীবনে। মেয়েমানুষের সাথে মিলনের জন্য এখন আর কোনো আফসোস নাই। জেলখানার ভিতরে মাইয়ামানুষ নাই। তাই লাভ নাই মাইয়ামানুষের সুখ নিয়া ভাইবা! আসলে সুখ নিতে জানলে মাইয়া লোক ছাড়াও নেওন যায়। আবার হয়তো কখনো নিজের সাথে নিজের টিটকারি চলে বডি হ্যান্ডেলের তরিকা নিয়ে। তোতার মতো বয়সী কত ছ্যামরা দেখল এই জেলজীবনে। আইলো, গেল, থাকল, গেল! কতগুলারে দিয়া মাথা, পিঠ, ঠ্যাং টিপাইল, দলাইল, পাড়াইল। কিন্তু কই! এমন কইরা কেউ তো খামচাইয়া ধরে নাই কলিজাটারে। নিজে ভাবে আত্মগত ভাবে, হালার কী জানি আছে এই পোলাডার মইদ্দে!

নিজের দামড়া শরীরটার জন্য যেমন লাগে মায়া, তেমন লাগে আফসোস। রাগে-ক্ষোভে ইচ্ছা হয় জেলের মোটা দেয়ালগুলো ভাঙতে। দিনের বহু সময় একা একা কথা বলে, শালার ফাডা কপাল! দৈত্যের মতো এমন শরীল হওনের পরও কিছুই ভোগ করতে পারলাম না দুনিয়াদারির। ধরা একখান খাইয়া জিন্দেগি গ্যালো জ্যালের মইদ্দেই। যাউকগা, কোনো আফছোস নাই। জ্যালখানার মইদ্দেও কী সুখের মালের আকাল পড়ছে! পোক ধরা ডাইল, পুরানো গান্দা চাইলের ভাত আর ছাতা ধরা গমের রুটিতে যদি এমন পেটাইননা শরীল থাকে! মিলিটারিগো মতো খাওন আর খাতির যত্ন পাইলে না জানি কী হইত! নিজের কালা কুইচকুইচ্চা শইলডার দিকে নিজেই তাকায়ে থাকে করুণার চোখে।

কীবে হালায় হিরো? অখনও তো ঠিকমতো মাল আহে নাই শইললে? এ্যার মইদ্দে হাত পাকাইস? তবে হালার পুত ধরাডা খাইলি ক্যান?

এই ছিল পরিচয়ের প্রথম পর্ব, ধরা খাই নাইকা, ধরা খাওয়াইছি। ছিনালের ঘরের ছিনাল, খানকির পুতে আমার উপরে ট্যাক্কা মারতে চাইছিল। দিছি একেবারে ঘেড়ির থেইকে ধড় নামাইয়া।

তোতা এই সেলে আসার আগেই আলি হোসেনের কাছে শুধু নয়, ওয়ার্ডের অনেকের কাছেই খবর পৌঁছে যায়। যেদিন নতুন কয়েদি আসে, সেদিন সবাই জানে আজ নতুন মেম্বার আসতেছে। খুনের আসামি হলে সকলের আগ্রহ থাকে বেশি।

আজ শুধু তোতা বা তার নয়, সকলের হাতেই থালা ধরা। কাঠের টেবিলের উপর বড় বড় গামলায় খাবার এনেছে কয়েদিরা। খাবার আসার আগেই লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর ঘণ্টা বাজে। আলি হোসেনের পালা এলে সে থালভরা খাবার নিয়ে এগিয়ে আসে তোতার পাশে। নিজের থালার দুই টুকরা মাংস থেকে এক টুকরা তুলে দেয় তোতাকে। তোতার তাতে আপত্তি নাই। তাকে বরং খুশি হতে দেখা যায় বাড়তি মাংসের টুকরা পাওয়ার সৌভাগ্যে। আজকের মতো যেদিনই মাছ-মাংসের দিন থাকে, আলি হোসেন সব সময়ই এভাবে তোতার প্লেটে তুলে দেয় নিজের অর্ধেক। তোতা হাজতি হয়ে আসার পর আলি হোসেনের ভাবনায় জটিল জটা পাকায়। বেশ পছন্দ হয় তার এই চ্যাংড়া ছ্যামরাডারে। কিন্তু হাঙ্গামা বাধায় মাহতাব।

কেমন যেন একটা ভাব নেয় মাহতাব হালায় সব সময়। যারে বলে আলগা ফুটাঙ্গি। হারামজাদার সাজা হইছে মাত্র দশ বছর। পঞ্চাইশ বছর হইলে ভালো হইত। পড়ালেখা জানে এই জন্য আলগা একটা দ্যামাগ। সবাই বলে সে নাকি এমবিবিএস ডাক্তার। তাই তাকে কোনো কঠিন কাজ দেয় না। তাকে দিয়ে কী সব কাগজপত্রের কাজ করায়। চুল-দাড়ি-মোচ সব একসাথে এত্ত বড় হয়েছে যে চেহারা-সুরতের কিছুই দেখা যায় না ঠিকমতো। এমন একটা জঙ্গলা মানুষরে কারো পছন্দ হইতে পারে, ভাবলেই ভেতরটা রাগে গোংরায় আলি হোসেনের। তার উপরে বেটা থাকে একদম চুপচাপ। কথা বলে না কারোর সাথে নিতান্ত দরকার ছাড়া। যে মানুষটা কারোর সাথে কথা কয় না, সেই মানুষটার তোতার সাথে খোশগল্পে ডুইবা যায়। তোতার কিয়ের এত্ত খাতির? তার বুঝতে বাকি নাই আসল কারণডা!

সেদিন বিকালে দূর থেকে আলি হোসেনের নজরে আসে, তোতা বসে আছে মাহতাবের গা ঘেঁষে। মাহতাব কিসের এত গল্প শোনায়! তোতা অবাক চোখে মাহতাবের দিকে তাকিয়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় আলি হোসেন। সারা দিনের ডিউটি শেষে বিকালের এই সময়টা কয়েদি-হাজতিরা সামান্য সুযোগ পায়

খোশগল্পে মেতে উঠতে। আলি হোসেনকে কাছে আসতে দেখেই আলাপ বন্ধ হয়ে যায় ওদের দুজনের। বেহায়ার মতো আলি হোসেন প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার, থামলেন ক্যান, মাহতাব ভাই? খুউব খোশগল্প হইতেছিল মনে হয়? চালান চালান, চালাইয়া যান, আমিও শুনি আপনার চাপাবাজি। কিন্তু তারপর মাহতাব আর গল্প চালায় না। খুউব অপমান বোধ করে আলি হোসেন।

জেলের সব ওয়ার্ডের ভেতরে এমনিতেই আলো কম। তুলনামূলক লম্বা হলঘরের মতো এই ওয়ার্ডের দুই মাথায় শুধুমাত্র দুইটা ষাট পাওয়ারের বাল্ব। এত বড় ওয়ার্ডের জন্য যথেষ্ট না ষাট পাওয়ারের দুই বাল্বের আলো। অল্প আলোর কারণে সন্ধ্যার সাথে সাথে যেমন রাজত্ব হয় তেলাপোকার, তেমন টিকটিকির। অভাব নাই জেলখানায় তেলাপোকাদের। বিশাল মোটা মোটা দেয়ালের খুপরিখাপরি, গোসলখানা, পায়খানা–সব জায়গাতেই তাদের বসত ও বংশ বৃদ্ধি চলছে নিরাপদে। সেই সব তেলাপোকাদের কচিগুলো খাওয়ায় পুরাদস্তুর ঝানু এই সব টিকটিকিরা। এখানকার টিকটিকিগুলোকেও আলি হোসেনের কাছে দামড়া মনে হয়। মাঝে মাঝে চকচকে পাকা ঝানু তেলাপোকারা দেয়ালে বেড়াতে বের হলে পিলপিলিয়ে এগোয় নধর শরীরের টিকটিকিগুলো। টিকটিকিদের তেলাপোকা ধরে খাওয়ার দৃশ্যে শুধু নয়, দেয়ালে টিকটিকিদের সংগমদৃশ্য দেখা গেলেই কয়েদিদের ভেতরে ডিগবাজি খায় রসিকতা। তখন হয়তো কয়েদির কাছ থেকে মন্তব্য আসতে থাকে–দ্যাখ, দ্যাখ, ফিটিংবাজি চলতাছে! এসব টিটকারি-মশকারির সময় টিকটিকিদের সংগম দেখলেও আলি হোসেনের শরীর মোচড়ায়, তখন তার ইচ্ছা হয় সাপের মতো শরীলডারে কারো লগে জোড়া লাইগাইয়া সারা দিন শঙ্খলাগা হইয়া থাকতে।

এই ওয়ার্ডের কয়েদি, হাজতি সব আজ কয়েক মাস যাবৎ এক সারিতে। কম করেও পঞ্চাশজন হবে এই ওয়ার্ডে কয়েদি-হাজতি মিলিয়ে। ঢাকা শহর শুধু নয়, সারা বাংলায় চলছে আন্দোলন। খেপে উঠেছে দেশ। হাজতিতে ভরে গেছে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সব সেল-ওয়ার্ড সবই। সাধারণত কয়েদিদের সাথে হাজতিদের একসাথে রাখে না। কিন্তু এখন সময় নাই সেসবের বাছবিচার করার। এই ওয়ার্ডের কয়েদিদের সাথে এখন অনেক নতুন হাজতি। কারোর নাকের ভেতরে বর্ষার ভরা পুকুরের ব্যাঙ ডাকার শব্দ। শুধু একজনের নাক থেকে নয়, কাত-চিত হয়ে শুয়ে থাকা একদল মানুষদের নাক ডাকার সাথে যোগ হচ্ছে কারো কারো দাঁত কাটার কটাস কটাস শব্দ, কারোর গালিগালাজ, গোংগানি। কাত হয়ে শুয়ে লম্বা-চওড়া মানুষটা অন্য সময় হলে নাক ডাকার উপরে এক কিস্তি গালিগালাজ বর্ষণ করে দিত। কিন্তু আজ আলি হোসেন পড়ে আছে একেবারে ঘাতি মেরে।

জেলের একই ওয়ার্ডের ভিতরে আলি হোসেনের মতো সকলের সাথে অন্ধকারে চিত হয়ে শুয়ে আছে মাহতাব। এখনো নামেনি মাঘের হাড়কাঁপানো

শীত। কয়েদি-হাজতির ভাগে দেয়া হয়েছে তিনখানা কালো কম্বল। এরই মাঝে দুবার উঠে বসে আলি হোসেন। প্রথমবার ওঠে প্রস্রাব করার জন্য, যখন এগিয়ে যায়, মনোযোগ দিয়ে দেখে নেয় মাহতাবকে। মাহতাবের পাশে শুয়ে আছে কম্বল জড়িয়ে তোতা। তোতার পায়ের গোড়ায় মাহতাবের ডান পায়ের পাতা। মাহতাবের পায়ের পাতা নজরে আসতেই আলি হোসেনের দেহের ভেতরে ফুঁসে ওঠে পুরাতন ক্রোধটা। হারামজাদা কি তাইলে কম্বলের তলেই...! ইচ্ছা হয় মাহতাবের পেটের উপর দুই পা তুলে খাড়া দাঁড়ায়ে ওর মুখের উপর পেচ্ছাব করতে। কিন্তু সে নিজের রাগ-খেদ সামলে ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগোয় পায়খানার দিকে। পায়খানা পর্যন্ত না যেয়ে প্রস্রাবের স্থানে দাঁড়িয়েই ছরছর করে ছেড়ে দেয়। মনে হলো প্রস্রাব নির্গতের সাথে কিছুটা প্রশমিত হলো ওর রাগ-খেদও। ফিরে আসার সময় সে কিছু একটা মতলব আঁটে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে।

রাত আরো গড়ায়। জেলখানার এই ভারী দেয়ালের বেষ্টনী ভেদ করে বহুদূর থেকে শিয়াল-কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। তিন ওয়ার্ড পরে পাগলদের ওয়ার্ড। সেখান থেকে ভেসে আসছে পাগলদের চেঁচামেচি, হই-হাঙ্গামা।

আহা, তোতা, জাওরার ঘরের জাওরা, এত্ত খাতির-আত্তি দেওনের পরও বেইমানটা অই খানকির পোলার লগেই শুইব। মনে মনে বিড়বিড়ায়, কিচ্ছু কমু না তরে, তুই যাই করস না ক্যান, তরে আমি যত্ত দিন আমার কবজায় না আনতে পারি, তত্ত দিন আমি তরে ত্যাল মাইরাই যামু।

আলি হোসেন আবারও এগিয়ে যেতে থাকে সারা শরীরে কম্বল জড়িয়ে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্বলে মোড়ানো বলে যে কেউ দেখলে ওকে চিনতে পারবে না। হঠাৎ ভয়ংকর আর্তচিৎকার ভেসে আসে মাহতাব-তোতার ওই দিক থেকে। তখন লক্ষ করলে দেখা যেত আলি হোসেন কম্বলখানা ফেলে দৌড় দিয়ে পালাল।

আজ মনখানি বড় অশান্ত হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর। আপনজনদের মুখগুলো সব যেন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার আকাশে শুকতারার মতো ভিন্ন ভিন্ন দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছে বুকের ধন, কলিজার টুকরোগুলো মুখ। তাকিয়ে আছে মায়ের ছলছল চোখ। কত দিন হয়ে গেছে মাকে দেখেনি, বাবাকে দেখেনি। অনেক দিন হয়ে গেল! আর রেণু? রেণু কি তারই মতো জেগে আছে হাচুকে কোলের কাছে জড়িয়ে। কত দিন দেখেনি ফুটফুটে হাচুকে। হাচুর মুখখানি ভেসে উঠতেই বুজে আসে চোখ দুটো আবেগে। আহা, কোমল হাতে গলা জড়িয়ে ধরে হাচু যখন বাবা সুরে ডাকে আর কত কথা বলে! ঘোলা ঘোলা চোখ দুটোতে মনে হয় পৃথিবীর সকল মায়া জড়ানো। তার জীবনের সাথে জড়িয়ে রেণুর জীবনটাও শুধু তার জন্য পথ চেয়েই কেটে গেল! এত ভালোবাসা তার জন্য বুকের গভীরে লুকিয়ে রেখেছে রেণু। কোনো দিন রেণু একটু অভিমানও করল না তার এই জেলখাটা, রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যাওয়া জীবন নিয়ে! উলটো রেণু তার পেছনে যেন আরেক মহাশক্তি,

মহামায়া, মহা অনুপ্রেরণা। কত দিন গভীর রাতে অন্ধকারে রেণুর কাছে গেছে চোরের মতো রেণুর একটুখানি ভালোবাসার কাঙাল হয়ে, রেণু তখন সোহাগের ছোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছে, যাও, রাত পোহানোর আগেই তুমি চলে যাও, তোমাকে আমি স্বার্থপরের মতো আগলে রাখতে চাই না আমার আঁচলতলে! তোমার ভালোবাসা সে তো আমি পেয়েছি গো, এখন যে তোমাকে দরকার দেশ মায়ের। আমি তোমাকে দেশ মায়ের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছি, আর আমার প্রেম, ভালোবাসা সে তো সবই তোমার। আমি তোমার সন্তানদের বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখেই দিন কাটাব, এখন তুমি তো দেশ মায়ের সেই সন্তান, যার দিকে তাকিয়ে আছে সারা দেশ!

বারান্দায় বসে একখানা বই নিয়ে সেটাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছেন ক্রমাগত। কিন্তু কিছুতেই বইয়ের পাতাতেও মন বসেনি। খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করে বলেছে, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' বঙ্গবন্ধুর সমস্ত শরীর পাথরের মতো ভার হয়ে আছে রাগে-ক্ষোভে। মাথার মধ্যে রীতিমতো যন্ত্রণা। রাগে-ক্ষোভে হাতের আঙুল মোচড়ান, দাঁতগুলো পিষে ধরেন। ভয়ংকর ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। যেভাবে হউক, প্রতিহত করতে হবে এই ষড়যন্ত্র।

দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু পালিয়ে যাবেন না, এটা আইবিরা খুউব ভালো করেই জানে। তাই তারা রাত জাগে না বঙ্গবন্ধুকে পাহারা দেয়ার জন্য। সুযোগ ও কায়দামতো ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে নেয় দেয়ালে হেলান দিয়ে পুলিশরা। শুধু পুলিশ নয়, ঘুমাচ্ছে গোয়েন্দা কর্মচারীরাও। হঠাৎ এ সময়ে কোথা থেকে একটা মানুষ এসে প্রথমে ধপ করে বসে পড়ল বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে। পরমুহূর্তেই সে গড়িয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর পেছনে আত্মগোপনের আশায়। ভাইজান, বাঁচান, আমাকে বাঁচান, ভাইজান, ধরতে পারলে আমারে মাইরা ফেলব পিটাইয়া।

বঙ্গবন্ধু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, ক্যানরে, কী করছস?

মারছি স্যার, একজনরে মারছি, কিন্তু স্যার, আপনে আমারে বাঁচান, আমারে নিয়া মারব, স্যার, মাইরা আমার হাড্ডিগুড্ডি সব গুঁড়া গুঁড়া কইরা দিব।

ক্যান, মারছস ক্যান? কী নাম তোর?

থরথর করে কাঁপে আলি হোসেন, ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না ভয়ে। স্যার, আমার লগে, আমার...আমার নাম আলি হোসেন। আলি হোসেনের কথা শেষ হয় না। সিপাহি, মেট, পাহারা, জমাদার সকলে হন্তদন্ত। একসাথে এসে দাঁড়ায় বঙ্গবন্ধুর ঘরের সামনের এই বারান্দায়। সকলেই কাঁচুমাচু, দ্বিধান্বিত।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু। ঘাড়ের কাছ থেকে খসে পড়া চাদরটা তুলে দিলেন আবার ঘাড়ের কাছে। সিপাহি এসে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার, শয়তানডা মাইরা মাহতাব নামের আরেক কয়েদির উপরের দাঁত পাঁচখানা ফালাইয়া দিছে। খুউব খারাপ অবস্থা। দ্যান স্যার, ডাকাইতটারে আমাদের কাছে